بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০২ এপ্রিল, ২০২১ মোতাবেক ০২ শাহাদাত, ১৪০০ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

গত খুতবার পূর্বে হযরত উসমান (রা.)-এর স্মৃতিচারণ চলছিল। আজও সেই একই ধারা অব্যাহত থাকবে। হযরত উসমান (রা.)-এর মাঝে পবিত্রতাবোধ ও লজ্জাশীলতার বৈশিষ্ট্য ছিল অনেক উন্নত মানের। এ সম্পর্কে হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) রেওয়ায়েত করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, আমার উম্মতের প্রতি সর্বাধিক অনুগ্রহকারী হলেন আবু বকর, আল্লাহ্‌র ধর্মের ক্ষেত্রে তাদের সবার চেয়ে দৃঢ় হলেন উমর, তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি লজ্জাশীল হলেন উসমান, তাদের মাঝে সর্বোত্তম সিদ্ধান্তদাতা হলেন আলী বিন আবি তালেব, তাদের সকলের মাঝে উবাই বিন কা'ব সর্বাধিক আল্লাহ্‌র কিতাব পবিত্র কুরআনের জ্ঞান রাখেন, তাদের মধ্যে হালাল ও হারাম সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জ্ঞান রাখেন মুআয বিন জাবাল, তাদের মাঝে সর্বাপেক্ষা অবশ্যপালনীয় দায়িত্বাবলীর জ্ঞান রাখেন যায়েদ বিন সাবেত। আর শোন! প্রত্যেক উম্মতের জন্যই একজন আমীন থাকেন আর এই উম্মতের আমীন হলেন আবু উবায়দা বিন জাররাহ্।

হযরত আনাস বিন মালেক (রা.)-এর পক্ষ থেকে রেওয়ায়েত হলো রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, আমার উম্মতের প্রতি সর্বাধিক অনুগ্রহকারী আবু বকর এবং আল্লাহ্ তা'লার বিধিনিষেধ পালন ও বাস্তবায়নে তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দৃঢ় উমর এবং তাদের মাঝে সবচেয়ে বেশি লাজ্জাশীল হলেন উসমান।

হযরত উসমান বিন আফ্‌ফান (রা.) বলেন, আমি কখনোই উদাসীনতা করি নি। আমি কখনো আকাঙ্ক্ষা করি নি, অর্থাৎ খিলাফতের বা অন্য কোন পদের কিংবা মিথ্যা বাসনা পোষণ করি নি।

হযরত আয়েশা (রা.) তাঁর লজ্জাশীলতা সম্পর্কে রেওয়ায়েত করেছেন এবং সেখানে তিনি (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমার গৃহে তাঁর রান অথবা গোছার কাপড় সরানো অবস্থায় শায়িত ছিলেন। এমন সময় হযরত আবু বকর (রা.) অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি (সা.) সে অবস্থাতেই তাকে অনুমতি প্রদান করেন। এরপর তিনি (সা.) কথা বলতে আরম্ভ করেন, এমন সময় হযরত উমর (রা.) (ভেতরে আসার) অনুমতি চাইলে তিনি (সা.) তাকেও সে অবস্থাতেই অনুমতি প্রদান করেন এবং তিনি (সা.) কথা অব্যাহত রাখেন। তারপর যখন হযরত উসমান (রা.) অনুমতি প্রার্থনা করেন তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) উঠে বসেন এবং নিজের কাপড় ঠিক করেন। হাদিসটির বর্ণনাকারী মুহাম্মদ বলেন, আমি এটি বলছি না যে, এসব কিছু একদিনেই ঘটেছে, বিভিন্ন সময়ের ঘটনা হতে পারে। তারা এসে কথাবার্তা বলে চলে যাওয়ার পর হযরত আয়েশা (রা.) নিবেদন করেন, যখন হযরত আবু বকর (রা.) এলেন, আপনি তার আসার কারণে তেমন একটা সাবধানতা অবলম্বন করেন নি, এরপর যখন উমর এলেন তখনও আপনি তার আসার কারণে তেমন একটা সাবধানতা অবলম্বন করেন নি, কিন্তু যখন উসমান ভেতরে এলেন তখন আপনি বসে পড়েন এবং নিজের কাপড় ঠিক করতে আরম্ভ করেন! প্রত্যুত্তরে তিনি (সা.) বলেন, আমি কি সেই ব্যক্তির সম্মান করব না যাকে দেখে ফেরেশতারা লজ্জা করে।

অন্য একস্থানে এই রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করতে গিয়ে একথা লেখা হয়েছে যে, হযরত আয়েশা (রা.) যখন নিবেদন করেন, শুধু হযরত উসমানের জন্যই যে আপনি বিশেষ এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন– তার কারণ কী? উত্তরে তিনি (সা.) বলেন, আমি কি তার প্রতি লজ্জাবোধ প্রদর্শন করব না যাকে দেখে ফেরেশতারাও পর্দা করে। সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রাণ! ফেরেশতারা উসমানের প্রতি ঠিক সেভাবেই লজ্জাবোধ প্রদর্শন করে যেভাবে তারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের সামনে লজ্জা করে। উসমান যদি ভেতরে আসতেন আর তখন যদি তুমি আমার পাশে থাকতে তাহলে (তুমি দেখতে) ফিরে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি তার মাথা উঠাতেন না, অর্থাৎ চোখ তুলে তাকাতেন না এবং কোন কথাও বলতেন না, তার মাঝে এতটাই পর্দা বা লাজুকতা রয়েছে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) হযরত উসমান (রা.)-এর ঘটনাটি আল্লাহ্ তা'লার গুণবাচক নাম 'করীম' এর প্রেক্ষাপটে বর্ণনা করেন; তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লা 'করীম'। তিনি বলেন, মহানবী (সা.)-এর একটি ঘটনা থেকে জানা যায় যে, 'করীম' বা সম্মানিত ব্যক্তির প্রতি লজ্জাবোধ প্রদর্শন করা হয়। (অর্থাৎ) যে ব্যক্তির মাঝে 'করীম' গুণ রয়েছে তার সামনে লজ্জাবোধ প্রদর্শন করা হয়ে থাকে। বিভিন্ন হাদিসে রয়েছে, মহানবী (সা.) একবার নিজ গৃহে শায়িত ছিলেন এবং তাঁর পায়ের কিয়দংশ উন্মুক্ত ছিল। এমন সময় হযরত আবু বকর (রা.) এসে বসে পড়েন আর এরপর হযরত উমর (রা.)-ও এসে বসে যান, কিন্তু তিনি (সা.) তেমন কোন গুরুত্ব দেন নি। কিছুক্ষণ পরে হযরত উসমান (রা.) দরজায় কড়া নাড়লে তিনি (সা.) তাৎক্ষণিকভাবে উঠে বসেন এবং নিজের পদ যুগল কাপড় দিয়ে ঢেকে নেন এবং বলেন, উসমান অনেক লজ্জাশীল, তাই তার সামনে পায়ের কোন অংশ খালি রাখতে লজ্জা হয়। এ প্রসঙ্গে হাদিসের শব্দগুলো ইতিপূর্বে বর্ণিতও হয়েছে। হযরত আয়েশা (রা.)-এর পক্ষ থেকে রেওয়ায়েত রয়েছে আর তা হলো, একবার মহানবী (সা.) বাড়িতে বসে ছিলেন আর তাঁর পায়ের গোছা থেকে কাপড় সরানো ছিল। এ অবস্থায়ই হযরত আবু বকর (রা.) ভেতরে আসার অনুমতি চাইলে তিনি (সা.) সেভাবে শুয়ে থেকেই অনুমতি দিয়ে দেন এবং তার সাথে আলাপচারিতায় রত থাকেন। এরপর উমর (রা.) অনুমতি চাইলে তিনি (সা.) তাকেও অনুমতি প্রদান করেন এবং সেভাবেই শুয়ে থাকেন; অর্থাৎ শুয়ে ছিলেন বা বসেছিলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পর হযরত উসমান (রা.) এলে মহানবী (সা.) উঠে বসেন এবং নিজের কাপড় টেনে দেয়ার পর তাকে ভেতরে আসার অনুমতি প্রদান করেন। সবাই চলে যাওয়ার পর হযরত আয়েশা (রা.) মহানবী (সা.)-কে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আবু বকর (রা.) এলেন, উমর (রা.) এলেন, কিন্তু আপনি তাদের আগমনের প্রতি তেমন কোন ভ্রুক্ষেপই করলেন না এবং যেভাবে শায়িত ছিলেন সেভাবেই শুয়ে থাকলেন। কিন্তু উসমান (রা.)-এর আগমনের সাথে সাথে আপনি উঠে বসলেন এবং নিজের কাপড় ঠিক করে নিলেন (কেন)? তিনি (সা.) উত্তরে বলেন, হে আয়েশা! আমি কি তার প্রতি লজ্জা প্রদর্শন করব না যাকে দেখে ফেরেশতারাও লজ্জা পায়।

অতএব দেখুন! রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত উসমান (রা.)-এর লজ্জাশীলতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন, কেননা তিনি (রা.) মানুষকে লজ্জা পেতেন, তাই তিনি (সা.)ও তার প্রতি লজ্জাবোধ প্রদর্শন করেন। অর্থাৎ হযরত উসমান (রা.) মানুষকে লজ্জা পেতেন, তাই মহানবী (সা.)ও তাকে লজ্জা করেছেন। এই ঘটনা উল্লেখ করে তিনি (রা.) বলেন, যেহেতু আল্লাহ্ তা'লা 'করীম', তাই মানুষের উচিত পাপ থেকে বাঁচার চেষ্টা করা। মানুষের লজ্জা করা উচিত এবং তাঁর কথা মান্য করা উচিত। পাপ করার ক্ষেত্রে ধৃষ্ট হওয়া ঠিক নয়। এটি ভাবা ঠিক নয় যে, আল্লাহ্ তা'লা অত্যন্ত অনুগ্রহ পরায়ণ, তিনি অনুগ্রহ করবেন। আমাদের পাপ থাকা সত্ত্বেও তিনি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন। তিনি বলেন, এ বিষয়টি দৃষ্টিপটে রাখা উচিত যে,

আল্লাহ্ তা'লার বৈশিষ্ট্য হলো তিনি 'করীম' বা সম্মানিত, তাই বান্দাদেরও উচিত লজ্জাশীলতা অবলম্বন করা এবং পাপ থেকে বাঁচার চেষ্টা করা।

(তাঁর) বিনয় ও সরলতা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, আব্দুল্লাহ্ রুমী বর্ণনা করেন, হযরত উসমান (রা.) নিজেই রাতের বেলা ওযুর ব্যবস্থা করতেন। তাঁর নিকট নিবেদন করা হয়, আপনি কোন সেবককে নির্দেশ দিলেই তো সে আপনার ওযুর ব্যবস্থা করে দিতে পারে। এ প্রেক্ষিতে তিনি বলেন, রাত তো তাদের জন্য, যাতে তারা বিশ্রাম করতে পারে। অর্থাৎ যারা কাজ করে এমন সেবকদের জন্য রাতে আরাম করার সুযোগ দেয়া উচিত।

আলকামা বিন ওয়াক্কাস (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত উসমান (রা.) যখন মিম্বরে ছিলেন তখন হযরত আমর বিন আস (রা.) তাঁর কাছে নিবেদন করেন, হে উসমান! আপনি তো এই উম্মতকে অনেক কঠিন একটি বিষয়ের মধ্যে ফেলে দিয়েছেন। অর্থাৎ উম্মতের উদ্দেশ্যে তিনি (রা.) খুতবা দেন, কিছু কথা বলেন, কিংবা উম্মতকে সতর্ক করেন। অতএব আপনি তওবা করুন এবং তারাও আপনার সাথে তওবা করবে। তিনি আল্লাহ্ সম্পর্কে ভীষণ ভয় দেখিয়ে ছিলেন, একারণে এক সাহাবী এই নিবেদন করেন। বর্ণনাকারী বলেন, এ প্রেক্ষিতে তিনি তখনই তার মুখ ক্বিবলামুখী করেন এবং দুই হাত উঠিয়ে বলেন, **'আল্লাহুম্মা ইন্নি আসতাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইকা'**। অর্থাৎ হে আল্লাহ্! নিশ্চয় আমি তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার সমীপে বিনত হচ্ছি। তখন উপস্থিত লোকেরাও তাদের হাত উঠিয়ে এই দোয়া করে। এটি ছিল আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভীতি এবং তার (রা.) বিনয়ের বৈশিষ্ট্য যে, কোন প্রকার বিতর্কে না জড়িয়ে তিনি তৎক্ষণাৎ দোয়ার জন্য হাত উঠান। নিজের জন্য দোয়া করেন এবং উম্মতের জন্যও দোয়া করেন। (তাঁর) উদারতা, বদান্যতা এবং আল্লাহ্ তা'লার পথে ব্যয় সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়াত বিদ্যমান রয়েছে। স্বয়ং হযরত উসমান (রা.) বর্ণনা করেন, আমার প্রভুর নিকট আমি দশটি জিনিস গোপন রেখেছি। সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে আমি হলাম চতুর্থ ব্যক্তি। আমি কখনো আমোদপ্রমোদের উদ্দেশ্যে গান শুনি নি আর মিথ্যা কথাও বলি নি। এছাড়া মহানবী (সা.)-এর হাতে বয়আত গ্রহণের পর থেকে আমি কখনোই আমার লজ্জাস্থান ডান হাতে স্পর্শ করি নি এবং ইসলাম গ্রহণের পর এমন কোন জুমুআ অতিবাহিত হয় নি, যে জুমুআয় আমি কোন কৃতদাস মুক্ত করি নি, শুধুমাত্র সে জুমুআ ছাড়া যখন আমার কাছে মুক্ত করার জন্য কোন কৃতদাস না থাকত। এমন অবস্থায় আমি জুমুআর দিনের পরিবর্তে অন্য কোন দিন কৃতদাস মুক্ত করে দিতাম। অজ্ঞতার যুগে কিংবা ইসলাম গ্রহণের পরও আমি কখনো ব্যভিচার করি নি।

হযরত উসমান (রা.)-এর মুক্তকৃতদাস আবু সাঈদ বর্ণনা করেন, হযরত উসমান (রা.) নিজ গৃহে অবরুদ্ধ অবস্থায়ও ২০ জন দাসকে মুক্ত করেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন, এক যুদ্ধে আমরা মহানবী (সা.)-এর সাথে ছিলাম তখন মানুষ ক্ষুধার কষ্টে জর্জরিত ছিল আর পরিস্থিতি এমন ছিল যে, মুসলমানদের চেহারায় আমি উদ্বিগ্নতা এবং মুনাফেকদের চেহারায় আনন্দের লক্ষণ প্রত্যক্ষ করলাম। এরূপ পরিস্থিতি লক্ষ্য করে মহানবী (সা.) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বেই আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের রিয্‌কের ব্যবস্থা করে দিবেন। এ বিষয়টি জানতে পেরে হযরত উসমান (রা.) বলেন, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল পরম সত্য বলেছেন। অতঃপর তিনি (রা.) শষ্য বোঝাই ১৪টি উট ক্রয় করেন এবং সেখান থেকে নয়টি উট মহানবী (সা.)-এর সমীপে পাঠিয়ে দেন। মহানবী (সা.) এটি দেখে বলেন, এগুলো কী? উত্তরে বলা হলো, হযরত উসমান (রা.) এগুলো আপনাকে উপহারস্বরূপ পাঠিয়েছেন। এতে মহানবী (সা.)-এর চেহারায় খুশি ও আনন্দ ফুটে উঠে আর মুনাফেকদের চেহারায় অস্থিরতা ও উদ্বিগ্নতা ছেয়ে যায়। তখন আমি দেখলাম, মহানবী (সা.) তাঁর দুই হাত এতটা উঠান যে, তাঁর বগলের শুভ্রতা দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল এবং তিনি হযরত উসমানের জন্য

দোয়া করেন। মহানবী (সা.)-কে আমি অন্য কারো জন্য এরূপ দোয়া করতে এর পূর্বে বা পরে কখনোই শুনি নি। আর সেই দোয়াটি ছিল, **'আল্লাহুম্মা আতে উসমানা, আল্লাহুম্মাফআল বেউসমানা'**। অর্থাৎ হে আল্লাহ্! উসমানকে অশেষ দান কর, হে আল্লাহ্! উসমানের ওপর তুমি নিজ অনুগ্রহ ও কৃপা বর্ষণ কর।

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) আমার কাছে এসে মাংস দেখে জিজ্ঞেস করেন, এগুলো কে পাঠিয়েছে। উত্তরে আমি বললাম, হযরত উসমান (রা.) পাঠিয়েছেন। তিনি (রা.) বলেন, একথা শোনার পর মহানবী (সা.)-কে আমি উসমান (রা.)-এর জন্য দুই হাত তুলে দোয়া করতে দেখেছি।

মুহাম্মদ বিন হেলাল তার দাদির পক্ষ থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত উসমান (রা.)-কে নিজ গৃহে অবরুদ্ধ করার পর তার দাদি তাঁর কাছে (প্রায়ই) আসতেন। তিনি বলেন, তার দাদির গর্ভে পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে আর তার নাম রাখা হয় হেলাল। একদিন হযরত উসমান তাকে (অর্থাৎ তার দাদিকে) দেখতে না পেয়ে জিজ্ঞেস করে জানতে পারেন যে, সেই রাতে তার গর্ভে পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। আমার দাদী বলেন, এতে হযরত উসমান আমার প্রতি পঞ্চাশ দিরহাম ও চাদরের একটি বড় টুকরো প্রেরণ করেন এবং বলেন, এটি তোমার পুত্রের জন্য ভাতা আর এটি হলো তার পরিধানের জন্য কাপড়। তার বয়স যখন এক বছর হবে তখন আমরা তার ভাতা বৃদ্ধি করে একশত দিরহাম করে দিব।

ইবনে সাঈদ বিন ইয়ারবূ বর্ণনা করেন যে, আমি একদিন দুপুরের পর ঘর থেকে বের হই, তখন আমি নিতান্ত এক শিশু ছিলাম। আমার কাছে একটি পাখি ছিল, যেটিকে আমি মসজিদে উড়াচ্ছিলাম। তখন দেখি সেখানে এক সুদর্শন বুযুর্গ শায়িত আছেন। তার মাথার নীচে ইট বা ইটের একটি টুকরো ছিল; অর্থাৎ বালিশের স্থলে ইট রাখা ছিল। আমি দাঁড়িয়ে আশ্চর্য হয়ে তার সৌন্দর্য অবলোকন করতে থাকি। তিনি নিজের চোখ খুলে আমাকে জিজ্ঞেস করেন যে, হে বালক! তুমি কে? আমি তাকে নিজের সম্পর্কে জানালে তিনি নিকটেই শায়িত এক ছেলেকে ডাকেন। কিন্তু সে কোন উত্তর দেয় নি। তখন তিনি আমাকে বলেন যে, তাকে ডেকে আন। অতএব আমি তাকে ডেকে আনি। সেই বুযুর্গ তাকে কিছু নিয়ে আসার নির্দেশ দেন এবং আমাকে বলেন যে, বসে পড়। অতঃপর সেই ছেলে চলে যায় আর একটি পোশাক ও এক হাজার দিরহাম নিয়ে আসে। তিনি আমার জামা খুলিয়ে তার স্থলে আমাকে সেই পোশাক পরিয়ে দেন। আর সেই এক হাজার দিরহাম উক্ত পোশাকের পকেটে রেখে দেন। আমি আমার পিতার কাছে গিয়ে তাকে পুরো ঘটনা অবহিত করি। তিনি বলেন, হে আমার পুত্র! তোমার কি জানা আছে যে, কে তোমার সাথে এরূপ ব্যবহার করেছে? আমি বললাম, আমার জানা নেই, কেবল এতটুকু বলতে পারি যে, তিনি এমন কোন ব্যক্তি ছিলেন যিনি মসজিদে শুয়ে ছিলেন আর তার চেয়ে অধিক সুশ্রী আমি আমার জীবনে আর কাউকে দেখি নি। তখন তিনি বলেন, তিনি হলেন আমীরুল মু'মিনীন হযরত উসমান বিন আফ্ফান (রা.)।

ইবনে জরীর বর্ণনা করেন যে, হযরত তালহা হযরত উসমানের সাথে তখন মিলিত হন যখন তিনি মসজিদের দিকে যাচ্ছিলেন। হযরত তালহা বলেন, আপনার পঞ্চাশ হাজার দিরহাম, যা আমার দায়িত্বে রাখা ছিল, সেগুলো এখন হাতে এসেছে। আপনি সেগুলো আদায় করার জন্য কোন ব্যক্তিকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন। এতে হযরত উসমান তাকে বলেন, আপনার ভালোবাসার কারণে আমি সেগুলো আপনার জন্য হেবা করে দিয়েছি, আমি তা আর ফেরত নিব না। আসমাঈ বলেন, কাতান বিন অউফ হিলালী-কে ইবনে আমের কিরমানের অঞ্চলে গভর্ণর নিযুক্ত করেন। তিনি চার হাজার মুসলমানের সৈন্য নিয়ে বের হন। পথিমধ্যে একটি উপত্যকা বৃষ্টির পানিতে প্লাবিত হয়, যার কারণে তাদের পথ বন্ধ হয়ে যায় আর কাতান-এর সময়মতো (গন্তব্যস্থলে) পৌঁছতে না পারার আশঙ্কা দেখা দিলে তিনি ঘোষণা

করেন, যে ব্যক্তি এই উপত্যকা পার করবে সে এক হাজার দিরহাম পুরস্কার পাবে। এতে মানুষ সাঁতরে উপত্যকা পার হতে থাকে। যখনই কোন ব্যক্তি উপত্যকা পার করত তখন কাতান বলতেন, তাকে তার 'জায়েযা' অর্থাৎ পুরস্কার দিয়ে দাও। এমনকি পুরো বাহিনী উপত্যকা পার করে ফেলে। আর এভাবে তাদের সবাইকে চল্লিশ লক্ষ দিরহাম প্রদান করা হয়। কিন্তু গভর্ণর ইবনে আমের কাতানকে উক্ত অর্থ দিতে অস্বীকৃতি জানান এবং বিষয়টি হযরত উসমান (রা.)-এর সমীপে লিখে পাঠান। এতে হযরত উসমান (রা.) বলেন, উক্ত অর্থ কাতান-কে দিয়ে দাও, কেননা সে তো আল্লাহ্ তা'লার পথে মুসলমানদের সহায়তা করেছে। অতএব উক্ত উপত্যকা পার করার কারণে সেই দিন থেকে পুরস্কার স্বরূপ প্রদানকৃত অর্থের নাম 'জাওয়ায়েয' হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করে, যা 'জায়েযা' শব্দের বহুবচন। হযরত উসমান একবার অসুস্থ হলে (তাঁর কাছে) কাউকে খলীফা মনোনীত করার অনুরোধ জানানো হয়। উক্ত ঘটনাকে হিশাম তার পিতার বরাতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, মারওয়ান বিন হাকাম আমাকে বলেন, যে বছর নাক দিয়ে রক্ত পড়ার রোগ (এপিস টেক্সিস) ছড়িয়ে পড়ে (সে বছর) হযরত উসমান বিন আফ্ফান (রা.)-ও মারাত্মকভাবে উক্ত ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। অর্থাৎ তাঁর নাক দিয়ে রক্ত পড়তে থাকে, এমনকি উক্ত অসুস্থতার কারণে তিনি হজ্জে যেতে অপারগ হয়ে পড়েন এবং তিনি ওসীয়্যত লিখিয়ে দেন। তখন কুরাইশদের এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলে যে, কাউকে খলীফা নিযুক্ত করে দিন। আপনার অবস্থার প্রেক্ষিতে কাউকে খলীফা মনোনীত করুন। হযরত উসমান (রা.) জিজ্ঞেস করেন, এ কথা কি মানুষ বলেছে? সে বলল, জ্বি হ্যাঁ। হযরত উসমান (রা.) পুনরায় জিজ্ঞেস করেন যে, তারা কাকে খলীফা বানাতে চায়? সেই ব্যক্তি চুপ থাকে। এরই মাঝে আরেক ব্যক্তি তাঁর কাছে আসে, (বর্ণনাকারী বলেন) আমার মনে হয় সে ছিল হারেস, এবং বলে, আপনি কাউকে খলীফা মনোনীত করুন। হযরত উসমান (রা.) বলেন, এ কথা কি লোকজন বলছে? সে বলল, জ্বি হ্যাঁ। হযরত উসমান (রা.) জিজ্ঞেস করেন, খলীফা কে হবে ? সে চুপ থাকে। হযরত উসমান (রা.) বলেন, সম্ভবত মানুষ যুবায়ের-এর কথা বলছে। সে বলল, জ্বি হ্যাঁ। হযরত উসমান (রা.) বলেন, সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! আমি যতদূর জানি, তিনি তাদের মাঝে নিশ্চয়ই সর্বোত্তম এবং মহানবী (সা.)-এর কাছেও তিনি তাদের মধ্যে সর্বাধিক প্রিয় ছিল।

হযরত উসমান (রা.) ওহী লিপিবদ্ধ করারও সুযোগ পেয়েছেন। একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, সূরা মুয্যাম্মেল অবতীর্ণ হবার সময় হযরত উসমান (রা.)-এর ওহী লিপিবদ্ধ করার সৌভাগ্য লাভ হয়েছিল। উম্মে কুলসুম বিন সামামাহ্ বর্ণনা করেন, আমি হযরত আয়েশা (রা.)-কে বললাম, আমরা আপনার নিকট হযরত উসমান (রা.) সম্পর্কে জানতে চাই, কেননা মানুষ তাঁর সম্পর্কে আমাদের কাছে অনেক বেশি জানতে চাইছে। এটি শুনে হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, একবার প্রচণ্ড গরমের এক রাতে আমি এই ঘরে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর সাথে হযরত উসমান (রা.)-কে দেখেছি যখনকিনা মহানবী (সা.)-এর ওপর হযরত জীবরাঈল (আ.) ওহী অবতীর্ণ করছিলেন। ওহী অবতীর্ণ হবার সময় মহানবী (সা.)-এর ওপর ভীষণ চাপ পড়তো যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা বলেন, إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا। অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আমরা তোমার প্রতি এক গুরুভার বাণী অবতীর্ণ করবো (সূরা আল মুয্যাম্মেল: ৫)। মহানবী (সা.)-এর সামনে বসে হযরত উসমান (রা.) লিখে যাচ্ছিলেন আর তিনি (সা.) বলছিলেন, হে উসমান! লিখতে থাক। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-এর এমন নৈকট্য কেবল নিতান্ত সম্মানিত ও মর্যাদাবান কোন ব্যক্তিকেই দান করেন।

হযরত আবু বকর (রা.)-এর খিলাফতকালে পবিত্র কুরআন লিখিতভাবে পুস্তকখণ্ডাকারে একত্রিত হয়, যা তিনি নিজের কাছে গচ্ছিত রেখেছিলেন। এরপর তা হযরত উমর (রা.)-এর কাছে ছিল। তারপর সেটি হযরত হাফসা বিনতে উমর (রা.)-এর কাছে ছিল।

হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতকালে কুরআনের সেই কপিটি তাঁর কাছে পৌঁছার বর্ণনা এভাবে পাওয়া যায় যে, হযরত হুযায়ফা বিন ইয়ামান (রা.) বর্ণনা করেন, তিনি ইরাকবাসীদের সাথে নিয়ে আর্মেনিয়া এবং আযারবাইজান বিজয়ের লক্ষ্যে সিরিয়াবাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিলেন আর সেখান থেকে ফিরে হযরত উসমান (রা.)-এর সকাশে উপস্থিত হন। হযরত হুযায়ফা (রা.) সেই এলাকার লোকদের কুরআন পঠনরীতির ভিন্নতার কারণে শঙ্কিত হন। তিনি হযরত উসমান (রা.)-এর নিকট নিবেদন করেন যে, হে আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহ্‌র কিতাবের বিষয়ে ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের ন্যায় মতবিরোধ আরম্ভ করার পূর্বেই আপনি এই উম্মতকে সামলান। এটি শুনে হযরত উসমান (রা.) হযরত হাফসা (রা.)-এর নিকট বার্তা প্রেরণ করেন যে, কুরআনের লিখিত পুস্তকখণ্ডগুলো আমার কাছে প্রেরণ করুন যাতে সেগুলোর অনুলিপি তৈরি করতে পারি। এরপর সেগুলো পুনরায় আপনাকে ফেরত দেয়া হবে। অতএব হযরত হাফসা (রা.) সেটি হযরত উসমান (রা.)-এর খিদমতে পাঠিয়ে দেন। হযরত উসমান (রা.) তখন হযরত যায়েদ বিন সাবেত, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়ের, হযরত সাঈদ বিন আস এবং হযরত আব্দুর রহমান বিন হারেস বিন হিশাম (রা.)-কে পবিত্র কুরআনের অনুলিপি প্রস্তুত করার নির্দেশ প্রদান করেন। হযরত উসমান (রা.) শোষোক্ত তিন সাহাবীকে, যারা কুরাইশ গোত্রভুক্ত ছিলেন, বলেন, তোমাদের এবং যায়েদের লিখিত কুরআনের কোন অংশ নিয়ে যদি কখনো মতবিরোধ দেখা দেয় তবে তোমরা সেটি কুরাইশদের ভাষায় লিপিবদ্ধ করো, কেননা কুরআন করীম কুরাইশদের ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব সেই সাহাবীরা উক্ত কাজ করেন। অনুলিপি প্রস্তুত হবার পর হযরত উসমান (রা.) মূল পুস্তকখণ্ডগুলো হযরত হাফসা (রা.)-কে ফেরত পাঠিয়ে দেন এবং নতুন কপিগুলো বিভিন্ন দেশে পাঠিয়ে নির্দেশ প্রদান করেন যে, এটি ছাড়া অন্যান্য যত অনুলিপি রয়েছে সেগুলো যেন পুড়িয়ে ফেলা হয়। আল্লামা ইবনুত্ তীন বলেন, হযরত আবু বকর ও হযরত উসমানের কুরআন সংকলনের ঘটনার মধ্যে পার্থক্য হলো, হযরত আবু বকর এই ভয়ে কুরআন সংকলন করেছিলেন যে, কুরআনের হাফেযদের মৃত্যুবরণের কারণে কুরআনের কোন অংশ কোথাও হারিয়ে না যায়, কেননা কুরআন একস্থানে জড়ো করা হয়নি। অতএব তিনি পবিত্র কুরআনকে এর আয়াতের সেই ধারাবাহিকতায় সংকলন করেন যেভাবে মহানবী (সা.) তাদেরকে পবিত্র কুরআন মুখস্থ করিয়েছিলেন। আর হযরত উসমানের কুরআন সংকলনের ঘটনা হলো, যখন পঠনরীতি বা কিরাআতে অনেক বেশি মতবিরোধ হতে থাকে, এখানকার লোকেরা নিজস্ব উচ্চারণ ও ভাষারীতি অনুযায়ী কুরআন পাঠ করতে আরম্ভ করে, এমনকি একে অন্যের পঠনরীতি বা কিরাআতকে ভুল আখ্যা দেয়া আরম্ভ করে, তখন তিনি শঙ্কিত হন যে, কোথাও এই বিষয়টি আবার চরম রূপ পরিগ্রহ না করে। সুতরাং তিনি সেই কপিগুলো, যা হযরত আবু বকর তৈরি করিয়েছিলেন, সূরার ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এক পুস্তকাকারে সংকলন করেন এবং শুধু কুরাইশদের ভাষারীতি রাখেন। তিনি এর সপক্ষে এই যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করেন যে, পবিত্র কুরআন কুরাইশদের ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। যদিও শুরুতে স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য অন্যান্য ভাষারীতি অনুযায়ীও কুরআন পাঠের অনুমতি দেয়া হয়েছিল, কিন্তু যখন তিনি দেখেন যে, এখন আর এরূপ করার প্রয়োজন নেই, তখন তিনি একই ভাষারীতির কিরাআত যথেষ্ঠ বলে ঘোষণা করেন। আল্লামা কুরতুবী বলেন, যদি এ প্রশ্ন করা হয় যে, হযরত উসমান মানুষকে স্বীয় সংকলিত কুরআনে ঐক্যবদ্ধ করার কষ্ট কেন করলেন, যখনকিনা তার পূর্বে হযরত আবু বকর উক্ত কাজ সম্পন্ন করে গিয়েছিলেন? তাহলে এর উত্তর হলো, হযরত উসমান যা করেছিলেন সেটির উদ্দেশ্য পবিত্র কুরআনের সংকলনে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করা ছিল না। আপনারা কি দেখতে পান না যে, হযরত উসমান উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসাকে বলে পাঠান যে, আপনি কুরআনের মূল পুস্তকখণ্ডগুলো আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। আমরা সেগুলোর

অনুলিপি প্রস্তুত করে মূল আপনার কাছে ফেরত পাঠাব। হযরত উসমান এ পদক্ষেপ শুধু এজন্য নিয়েছিলেন যে, কুরআন পড়ার রীতি বা কিরাআত সম্পর্কে মানুষ মতভেদ আরম্ভ করেছিল, কেননা সাহাবীগণ বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে পড়েছিলেন এবং পঠনরীতির বিরোধ চরম আকার ধারণ করেছিল। সিরিয়া ও ইরাকবাসীদের মধ্যে বিরোধ এমন চরম আকার ধারণ করে যা হযরত হুযায়ফা বর্ণনা করেছেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) সূরা আ'লার আয়াত سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ-এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে আমরা তোমাকে সেই বাণী শিখাব যা তুমি কিয়ামত পর্যন্ত ভুলবে না। বরং এ বাণী সেভাবেই সুরক্ষিত থাকবে যেভাবে এখন রয়েছে। অতএব এ দাবির প্রমাণ হচ্ছে ইসলামের চরম শত্রুগণও বর্তমানে অকপটে স্বীকার করে যে, কুরআন করীম অবিকল সেই একই রূপ ও অবস্থায় সুরক্ষিত আছে যেই রূপ ও অবস্থায় মহানবী (সা.) এটিকে উপস্থাপন করেছিলেন। নলডিকি, স্প্রিঙ্গার এবং উইলিয়াম মুর, সবাই নিজ নিজ পুস্তকে স্বীকার করেছেন যে,

অকাট্য ও নিশ্চিতরূপে আমরা কেবল কুরআন ব্যতীত অন্য কোন ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে এটি বলতে পারি না যে, ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা যে অবস্থায় উক্ত পুস্তক পেশ করেছিলেন সেই একই রুপে তা পৃথিবীতে বিদ্যমান রয়েছে। শুধুমাত্র কুরআনই এরূপ একটি ধর্মগ্রন্থ যেটি সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) স্বীয় সাহাবীদেরকে এটি যে অবস্থায় দিয়েছিলেন অবিকল সেই রূপেই তা এখনও বিদ্যমান আছে। এরা যেহেতু এটি বিশ্বাস করে না যে, পবিত্র কুরআন খোদা তা'লা অবতীর্ণ করেছেন, বরং তাদের বিশ্বাস হলো, মুহাম্মদ (সা.) স্বয়ং এটি রচনা করেছেন, তাই যদিও তারা একথা বলে না যে, যেরূপে এই গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছিল ঠিক সেরূপেই বিদ্যমান আছে, কিন্তু একথা তারা অবশ্যই বলে যে, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) যেরূপে এই কিতাব উপস্থাপন করেছিলেন সেরূপেই এ গ্রন্থ এখনও পৃথিবীতে বিদ্যমান আছে। যেমন স্যার উইলিয়াম মুর তার The Qur'an পুস্তকে লিখেন,

এই সকল প্রমাণ হৃদয়কে পূর্ণরূপে আশ্বস্ত করে যে, সেই কুরআন যা আজ আমরা পাঠ করি, এর প্রতিটি অক্ষর তা-ই যা মহানবী (সা.) মানুষকে পাঠ করে শুনিয়েছিলেন।

এরপর স্যার উইলিয়াম মুর নিজ কিতাব 'লাইফ অব মুহাম্মদ'-এ লিখেন, এখন আমাদের হাতে যে কুরআন আছে, হতে পারে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) নিজ যুগে এটিকে নিজেই রচনা করেছিলেন আর কোন সময় এর মাঝে নিজেই কতক পরিবর্তনও করে থাকবেন, কিন্তু এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এটি সেই কুরআন যা মুহাম্মদ (সা.) আমাদেরকে দিয়েছিলেন। একইভাবে তিনি আরো লিখেন, আমরা দৃঢ় ধারণার ভিত্তিতে বলতে পারি যে, কুরআনে লিপিবদ্ধ প্রত্যেকটি আয়াত সেই মূল অবস্থায় বিদ্যমান এবং এটি মুহাম্মদ (সা.)-এর অপরিবর্তিত রচনা।

এরপর জার্মান প্রাচ্যবিদ নলডিকি লিখেন, সামান্য লিপিপ্রমাদ হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু উসমান জগতের সামনে যে কুরআন উপস্থাপন করেছেন, এর বিষয়বস্তু ঠিক তা-ই আছে যা মুহাম্মদ (সা.) উপস্থাপন করেছিলেন। অর্থাৎ এর বিন্যাস বিস্ময়কর। ইউরোপিয়ান আলেমদের এটি প্রমাণের চেষ্টা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে যে, কুরআনে পরবর্তী যুগেও কোন পরিবর্তন এসেছে।

মোটকথা ইউরোপিয়ান লেখকরাও একথা স্বীকার করেছে যে, যতদূর কুরআনের বাহ্যিক সুরক্ষার বিষয়টি রয়েছে, এক্ষেত্রে কোনরূপ সন্দেহ করার সুযোগ নেই। বরং প্রতিটি শব্দ ও অক্ষর হুবহু তা-ই যা মুহাম্মদ (সা.) মানুষকে পড়ে শুনিয়েছেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, মানুষ হযরত উসমান (রা.)-কে কুরআন সংকলনকারী বলে থাকে। এ কথা ভুল, উসমান কেবল শব্দের সাথে ছন্দের মিল দেখিয়েছেন। অবশ্য, কুরআনের প্রচারক-প্রসারক বললে কিছুটা সঠিক বলে মানা যায়। তাঁর

খিলাফতের যুগে ইসলাম দূর দূরান্তে বিস্তার লাভ করেছিল, তাই তিনি কয়েকটি অনুলিপি প্রস্তুত করিয়ে মক্কা, মদিনা, সিরিয়া আর বসরা ও কুফা ছাড়াও বিভিন্ন শহরে প্রেরণ করেছিলেন। আর একত্রিকরণের বিষয়টি তো আল্লাহ্ তা'লার মনোনীত বিন্যাস অনুযায়ী মহানবী (সা.)-ই করেছিলেন। আর সেই পছন্দনীয় বিন্যাসই আমাদের হাতে পৌঁছানো হয়েছে। হ্যাঁ, এটি পড়া এবং হৃদয়ঙ্গম করার দায়িত্ব আমাদের সবার।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত উসমান (রা.)-এর যুগে মক্কা, মদিনা, নাজাদ, তায়েফ ও ইয়েমেনের লোকেরা স্ব স্ব অঞ্চলে বসবাস করা আর একে অপরের ভাষা এবং প্রবাদের বিষয়ে অনবহিত হওয়া সত্ত্বেও মদিনা রাজধানী হওয়ার সুবাদে সকল জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। সেই সময় মদিনাবাসী শাসক ছিল, যাদের মাঝে একটি বড় অংশ মক্কার মুহাজের ছিল আর স্বয়ং মদীনাবাসীও মক্কাবাসীদের সান্নিধ্যে হিজাযী আরবী শিখে গিয়েছিল। অতএব আইন প্রয়োগ যেহেতু তাদের মাধ্যমেই হতো, অর্থ-সম্পদও তাদের অধীনেই ছিল তথা রাজত্ব যাদের হাতে ছিল আর মানুষ তাদের পথপানে চেয়ে থাকত, সেসময় তায়েফ, নাজাদ, মক্কা, ইয়েমেন ও অন্যান্য এলাকার অধিকাংশ লোক মদিনায় আসা-যাওয়া করত আর মদিনার মুহাজের ও আনসারদের সাথে সাক্ষাৎ করত এবং ধর্ম শিখতো। এভাবে সকল দেশের মানুষের জ্ঞান-প্রজ্ঞার ভাষা এক ও অভিন্ন হতে থাকে। এরপর তাদের মাঝ থেকে কতক মদিনাতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। তাদের ভাষা অনেকটা হিজাযী হয়ে গিয়েছিল। এরা যখন নিজেদের দেশে ফেরত যেত আর আলেম এবং শিক্ষক হওয়ার কারণে নিশ্চিতভাবে তাদের এলাকায় তাদের ফিরে যাবার সুবাদে অবশ্যই প্রভাব পড়তো। এছাড়া বিভিন্ন যুদ্ধের কারণে আরবের বিভিন্ন গোত্রের একতাবদ্ধ হয়ে থাকার সুযোগ হতো আর নেতা যেহেতু বড় বড় সাহাবীরা হতেন, তাদের সাহচর্য এবং তাদের অনুকরণ করার বাসনা ভাষায় অভিন্ন বৈশিষ্টের জন্ম দিত। অতএব প্রথমদিকে হয়ত মানুষের পবিত্র কুরআনের ভাষা বুঝতে সমস্যা হতো, কিন্তু মদিনা রাজধানী হবার পর যখন সমস্ত আরবের কেন্দ্র হলো 'মদিনা মুনাওয়ারা' আর বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী বারবার সেখানে আসা আরম্ভ করে, তখন এই ভিন্নতার কোন আশংকা আর রইল না। কেননা ততদিনে সকল জ্ঞানবুদ্ধির মানুষ কুরআনের ভাষার সাথে পুরোপুরি পরিচিত হয়ে গিয়েছিল। যখন মানুষজন ভালোভাবে পরিচিত হয়ে যায়, তখন হযরত উসমান (রা.) নির্দেশ দেন যে, এখন থেকে যেন কেবল হেজাযি কিরাআত পড়া হয়, অন্য কোন কিরাআতে (কুরআন) পড়ার অনুমতি নেই। তার এই নির্দেশের অর্থ এটিই ছিল যে, এখন মানুষজন হেজাযের ভাষা মোটামুটি বুঝতে শিখে গিয়েছে, তাই তাদেরকে হেজাযি আরবীতে ব্যবহৃত শব্দের বিকল্প শব্দ ব্যবহারের অনুমতি প্রদানের কোন যৌক্তিক কারণ নেই। হযরত উসমানের এই নিদের্শের কারণেই শিয়ারা, যারা সুন্নীদের বিরোধী, তারা বলে থাকে যে, বর্তমান কুরআন 'বিয়াযে উসমানী' বা উসমানের রচিত গ্রন্থ। অথচ এই আপত্তি সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত! হযরত উসমান (রা.)-এর যুগ পর্যন্ত আরববাসীদের পরস্পর মেলামেশার এক দীর্ঘ যুগ অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছিল, আর তারা পারস্পরিক মেলামেশার ফলে একে অপরের ভাষার পার্থক্য সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত হয়ে গিয়েছিল। সেই সময়ে গিয়েও মানুষজনকে (ভিন্ন) কিরাআতে কুরআন শরীফ পড়ার অনুমতি দেয়ার কোন প্রয়োজনই ছিল না। এই অনুমতি কেবল সাময়িকভাবে দেয়া হয়েছিল এবং তা এই প্রয়োজন সাপেক্ষে ছিল যে, সেটি প্রাথমিক যুগ ছিল, জাতি-গোষ্ঠী পরস্পর বিভক্ত ছিল আর ভাষার সামান্য পার্থক্যের কারণে বিভিন্ন শব্দের অর্থও বদলে যেত। এই ত্রুটির কারণে সেসব গোত্রে প্রচলিত কিছু শব্দ সাময়িকভাবে প্রকৃত ওহীর বিকল্প হিসেবে খোদা তা'লার ওহী অনুসারে পড়ার অনুমতি দেয়া হয়েছিল যেন কুরআন শরীফের নির্দেশাবলী বুঝতে ও এর শিক্ষামালা বুঝার ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না হয়, আর প্রত্যেক (আঞ্চলিক) ভাষাভাষী নিজ ভাষার বাগধারায় এর নির্দেশাবলী বুঝতে

পারে এবং স্ব স্ব রীতিতে পড়তে পারে। যখন এই অনুমতির পর বিশ বছর সময় অতিক্রান্ত হয়ে যায়, তখন যুগের অবস্থা এক নতুন রূপ ধারণ করে, জাতি-গোষ্ঠীগুলো এক নতুন রং ধারণ করে, বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীতে বিভক্ত আরববাসী এক অসাধারণ জাতি, বরং বলা যায় এক অসাধারণ রাষ্ট্রে পরিণত হয়; দেশে আইন-কানুন প্রতিষ্ঠা ও শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন তাদের কর্তৃত্বে চলে আসে, প্রশাসনিক পদের বণ্টন তাদের কর্তৃত্বাধীন হয়ে যায়, শাস্তি ও বিচার ব্যবস্থার প্রচলনও তারাই আরম্ভ করে; এই সব কিছুর পর কুরআনের প্রকৃত ভাষা বুঝার ক্ষেত্রে মানুষজনের আর কোন সমস্যা ছিল না। আর অবস্থা যখন এরূপ দাঁড়ায়, তখন হযরত উসমান (রা.)-ও সেই সাময়িক অনুমতি, যা কেবলমাত্র সাময়িক প্রয়োজনে প্রদান করা হয়েছিল, সেটিকে রহিত করেন, আর এটি-ই আল্লাহ্ তা'লার অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু শিয়ারা যেটিকে হযরত উসমান (রা.)-এর সবচেয়ে বড় অপরাধ আখ্যা দেয় তা এ-ই যে, তিনি ভিন্ন ভিন্ন কিরাআত বন্ধ করে কেবল এক-অভিন্ন কিরাআতের প্রচলন করেন, অথচ যদি তারা গভীরভাবে চিন্তা করত তাহলে সহজেই বুঝতে পারত যে, খোদা তা'লা বিভিন্ন কিরাআতে কুরআন শরীফ পড়ার অনুমতি ইসলামের দ্বিতীয় যুগে দিয়েছিলেন, প্রাথমিক যুগে তা দেন নি। এর পরিষ্কার অর্থা হলো, যদিও কুরআন শরীফ হিজাযের ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে, কিন্তু কিরাআতের ভিন্নতা হয়েছে অন্যান্য গোত্রের ইসলাম গ্রহণের পর। যেহেতু কখনো কখনো এক গোত্র ভাষাগত দিক থেকে অন্য গোত্রের সাথে কিছুটা বৈসাদৃশ্য রাখতো, হয় তারা উচ্চারণ সঠিকভাবে করতে পারতো না বা অর্থগত দিক থেকে সেই শব্দগুলোর মধ্যে পার্থক্য হয়ে যেতো, তাই মহানবী (সা.) আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছার অধীনে কতিপয় বিতর্কিত শব্দের উচ্চারণ পরিবর্তনের বা সেই শব্দের স্থলে অন্য শব্দ ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করেন। কিন্তু এতে কুরআনের আয়াতের অর্থ বা তাৎপর্যে কোন পার্থক্য হতো না; বরং যদি এই অনুমতি না দেয়া হতো, তাহলেই পার্থক্য সৃষ্টি হতো। যেমন এই বিষয়টির প্রমাণ এ ঘটনা থেকে পাওয়া যায় যে, মহানবী (সা.) একটি সূরা আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদকে একভাবে পড়িয়েছেন, আর হযরত উমরকে আরেকভাবে পড়িয়েছেন। কারণ হযরত উমর সম্পূর্ণ শহুরে মানুষ ছিলেন, আর হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ মেষ চরাতেন, এজন্য বেদুইন লোকদের সাথে তার বেশি সম্পর্ক ছিল; আর উভয় ভাষার মাঝে যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। একদিন আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ কুরআন শরীফের সেই সূরাটিই পড়ছিলেন, আর ঠিক সেই সময়েই হযরত উমর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদকে সেই সূরা কিছুটা ভিন্নতার সাথে তিলাওয়াত করতে শোনেন। তিনি খুব অবাক হন যে, এটি কেমন কথা, শব্দাবলী এক রকম আর পাঠ করছে ভিন্ন রীতিতে। সুতরাং তিনি হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ এর গলায় কাপড় পেঁচিয়ে বলেন, চল মহানবী (সা.)-এর কাছে এক্ষুনি তোমার বিষয়টি উপস্থাপন করছি। তুমি সূরার কতিপয় শব্দাবলী ভিন্ন রীতিতে পাঠ করছ, অথচ মূল সূরা অন্য রকম। যাহোক তিনি তাকে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে নিয়ে যান এবং নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনি এই সূরা আমাকে এক রীতিতে পড়িয়েছেন আর আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ ভিন্ন রীতিতে পাঠ করছিলেন। মহানবী (সা.) আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদকে বলেন, তুমি কীভাবে পাঠ করছিলে? তিনি ভয়ে কম্পমান ছিলেন যে, আমি কোথাও ভুল করছি নাতো? কিন্তু মহানবী (সা.) বলেন, ভয় পেও না, পড়। তিনি পাঠ করে শুনালে মহানবী (সা.) বলেন, একেবারে সঠিক পড়েছে। হযরত উমর (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনি তো আমাকে ভিন্নভাবে পড়িয়েছেন। তিনি (সা.) বলেন, সেটিও ঠিক আছে। পুনরায় তিনি (সা.) বলেন, কুরআন করীম সাতটি কিরাআতে অবতীর্ণ হয়েছে। তোমরা এরূপ তুচ্ছ তুচ্ছ বিষয়ে পরস্পর বাগ্‌বিতণ্ডা করো না। এ প্রার্থক্যের কারণ মূলত এটিই ছিল যে, মহানবী (সা.) মনে করেন, আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ মরুচারী এবং তার উচ্চারণ রীতি ভিন্ন। তাই তার উচ্চারণ রীতি অনুযায়ী যে কিরাআত ছিল তা তাকে

পড়িয়েছেন। হযরত উমর সম্পর্কে তিনি (সা.) ভাবেন, সে খাঁটি শহুরে, তাই তাকে মূল মক্কী ভাষায় অবতীর্ণ কিরাআত শিখিয়েছেন। অতএব তিনি আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদকে তার ভাষায় সূরা পাঠের অনুমতি দেন এবং হযরত উমর (রা.)-কে খাঁটি শহুরে ভাষায় সেই একই সূরা পড়ান। এ ধরনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্থক্য, যা ভিন্ন ভিন্ন কিরাআতের কারণে সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু মূল বিষয়বস্তুতে এর কোন প্রভাব পড়ত না। প্রত্যেকে বুঝতে পারতো যে, এটি সংস্কৃতি-সামাজিকতা, শিক্ষা এবং ভাষার পার্থক্যের এক আবশ্যকীয় ফলাফল। পুনরায় তিনি বলেন, যখন সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার ফলে গোত্রীয় অবস্থা এক জাতি ও এক ভাষায় রূপান্তরিত হয় এবং সবাই হিজাযী ভাষার সাথে পরিচিত হয়ে যায়, তখন হযরত উসমান মনে করেন এবং তিনি যথার্থ মনে করেছেন যে, এখন এই (ভিন্ন ভিন্ন) কিরাআতকে প্রতিষ্ঠিত রাখা মতবিরোধ দীর্ঘ করার কারণ হবে, তাই এসব কিরাআতের সাধারণ ব্যবহার এখন বন্ধ করা উচিত। অবশিষ্ট কিরাআতের পাণ্ডুলিপি তো সংরক্ষিত থাকবেই। সুতরাং এ সুধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি সার্বজনীন ব্যবহারে হিজাযী ও মূল কিরাআত ব্যতীত অবশিষ্ট কিরাআত নিষিদ্ধ করেন এবং আরব-অনারব সবাইকে এক ও অভিন্ন কিরাআতে একত্রিত করতে তিলাওয়াতের জন্য এমন অনুলিপি তৈরির অনুমতি প্রদন করেন যা প্রাথমিক যুগের কিরাআত অনুসারে ছিল।

কিছু স্মৃতিচারণ অবশিষ্ট রয়ে গেছে। ইনশাআল্লাহ্ ভবিষ্যতে (বর্ণিত হবে)। আজও পাকিস্তান এবং আলজেরিয়ার আহমদীদের জন্য এবং বিশ্বের যেখানেই আহমদীরা সমস্যার সম্মুখীন তাদের সকলের জন্য দোয়ার অনুরোধ করতে চাই। দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা তাদের সমস্যাবলী দূর করুন এবং বিশেষত পাকিস্তানে (দেশীয়) আইনের কারণে বিভিন্ন সময় সমস্যা তৈরি করা হয়। আহমদীদের এখন কোন স্বাধীনতা নেই। একইভাবে আলজেরিয়ায়ও কতিপয় সরকারী কর্মকর্তা সমস্যা সৃষ্টি করতে থাকে। আল্লাহ্ তা'লা, আহমদীদেরকে এসব বিপদ থেকে মুক্ত করুন।

জুমুআর নামাযের পর আমি একটি ওয়েবসাইটের উদ্বোধন করব, এটি চীনি ডেস্কের ওয়েবসাইট এবং কেন্দ্রীয় আইটি টিমের সাহায্যে এই ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়েছে। যার ফলে মানুষ চীনা ভাষায় ইসলাম এবং আহমদীয়াত সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যাদি পাবে। এই ওয়েবসাইটটি জামাতের মূল ওয়েবসাইটের মাধ্যমেও এবং পৃথকভাবেও ভিজিট করা সম্ভব হবে। বিভিন্ন শিরোনামে এতে তথ্য-উপাত্ত সন্নিবেশিত করা হয়েছে। চীনা ভাষায় অনুদিত পবিত্র কুরআনের নতুন সংস্করণও এতে রয়েছে। এছাড়াও তেইশটি বিভিন্ন পুস্তক ও লিফলেট রাখা হয়েছে। প্রশ্নোত্তর বিভাগে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়েছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর শিরোনামের অধীনে হুযূর আকদাস (আ.) এবং খলীফাদের পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে। প্রথম পাতায় জামা'তের বিভিন্ন ৬টি ওয়েবসাইটের লিঙ্ক দেয়া হয়েছে। এছাড়া যোগাযোগের জন্য ফোন, ফ্যাক্স এবং ইমেইল ইত্যাদির বিস্তারিত তথ্য দেয়া হয়েছে। এই ওয়েবসাইট চীনা জনসাধারণের জন্য হেদায়েতের কারণ হবে এছাড়া ইসলাম ও আহমদীয়াতের জন্য তাদের হৃদয় উন্মুক্ত হবে; আল্লাহ্ তা'লার কাছে এটিই আমার প্রত্যাশা।

এছাড়া আমি প্রয়াত কয়েকজনের জানাযার নামাযও পড়াব। প্রথমত যার উল্লেখ করব তিনি হলেন, মোহতরম মুহাম্মদ ইউনুস খালেদ সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্। তিনি গত ১৫ মার্চ তারিখে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ৬৭ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। মুহাম্মদ ইউনুস খালেদ সাহেবের দাদা হযরত মিয়া মুরাদ বখশ সাহেব এবং তার ভাই হযরত হাজী আহমদ সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন। ছয় সদস্য বিশিষ্ট একটি কাফেলা হাফেজাবাদ জেলার অন্তর্গত মৌজা প্রেম কোট থেকে পায়ে হেঁটে কাদিয়ান গিয়েছিলেন। এই কাফেলাতে হযরত হাজী আহমদ সাহেবও ছিলেন। তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করেন এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাছ থেকে

তবার্‌রক স্বরূপ পানি চাইলে তিনি (আ.) তা প্রদান করেন। মোকার্‌রম ইউনুস খালেদ সাহেব রাবওয়া থেকে মেট্রিক পাস করে জামেয়ায় ভর্তি হয়ে যান এবং জামেয়াতে অধ্যয়নরত অবস্থায় আরবীতে সম্মানও সম্পন্ন করেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি ওসীয়্যতকারী ছিলেন। ১৯৮০ সনে জামেয়া আহমদীয়া থেকে শাহেদ পাস করেন। এরপর ৪০ বছর পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় জামা'তের কাজ করার সৌভাগ্য পেয়েছেন। পাকিস্তানেও এবং বহির্বিশ্বে আফ্রিকায় কাজ করার তৌফিক পেয়েছেন। তিনি শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্ত্রী মরিয়ম সিদ্দীকা, এক পুত্র আতিক আহমদ মুবাশ্বেরকে রেখে গেছেন, যিনি জামা'তের মুরব্বী। এই আতিক আহমদ মুবাশ্বের সাহেব বলেন, আমার পিতা সৎকর্মশীল আলেম ছিলেন। তিনি প্রায়শই বলতেন, খোদা তা'লা আমার সাথে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর মতো ব্যবহার করেছেন। যখনই আমার কোন প্রয়োজন দেখা দেয় আল্লাহ্ তালা নিজ অনুগ্রহে তা পূর্ণ করে দেন আর আমি নিজেও এটি কয়েকবার দেখেছি। এই ছেলেই রানা মোবারক সাহেবের বরাতে আরো বলেন, রানা সাহেব লাহোরের হালকা প্রেসিডেন্ট ছিলেন; তিনি বলেন, জামা'তী কোন কাজ এলে শ্রদ্ধেয় মুরব্বী সাহেব তাৎক্ষণিকভাবে তা সম্পাদন করতেন। এমনকি জুতা পরেছেন কিনা তা-ও চিন্তা করতেন না। তৎক্ষণাৎ দ্রুততার সাথে কাজের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়তেন। আর্থিক কুরবানীতে উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অংশগ্রহণ করতেন। হরিপুর হাজারার আমীর সাহেব বলতেন, মুরব্বী সাহেব পুরো তরবেলা জামা'তের জন্য চাঁদা দেয়ার ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত ছিলেন। প্রয়াত পুণ্যাত্মা সদস্যদের চাঁদাও তিনি রীতিমত প্রদান করতেন। তার ভায়রা বলেন, চাঁদা প্রদানের ক্ষেত্রে তিনি খুবই সচেতন ছিলেন বিশেষভাবে তাঁর ওসিয়্যতের চাঁদা আদায়ে সর্বদা সোচ্চার থাকতেন। মরহুম খুবই দোয়াগো ও দরবেশ প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। মরহুম দরিদ্র অভাবীদের খুঁজে খুঁজে গোপনে তাদের সাহায্য করতেন। আত্মীয়স্বজনের মাঝে দরিদ্রদের মেয়েদের বিয়ে উপলক্ষ্যে গয়নাগাটি ও জিনিসপত্র কিনে দিতেন। মরহুমের আত্মীয়স্বজন বলেন, আমরা একজন আন্তরিক, স্নেহশীল ও আর্থিক সাহায্যকারী অতি প্রিয় অনুগ্রহশীল ব্যক্তিত্বকে হারিয়েছি। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের সাথে ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন।

দ্বিতীয় জানাযা হলো, আইভরি কোস্টের শ্রদ্ধেয় ডাক্তার নিযামুদ্দীন বুদ্দন সাহেবের। তিনি গত ১৫ মার্চ তারিখে ৭৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি তার প্রাথমিক শিক্ষা মরিশাসে অর্জন করেন। ১৯৬৮ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.) তাকে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করেন এবং পাকিস্তানে এসে তিনি প্রথমে তা'লীমুল ইসলাম কলেজ থেকে ইন্টারমেডিয়েট করেন, এরপর মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। তিনি ডো মেডিকেল কলেজ থেকে এম.বি.বি.এস. করেন। ১৯৭৮ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) তাকে নাইজেরিয়ার আহমদীয়া ক্লিনিকে ক্লিনিক-ইনচার্জ হিসেবে নিযুক্ত করেন এবং ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত তিনি সেখানে কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করেন। ১৯৮০ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) যখন ঘানা সফরে যান, সেসময় আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত আইভরি কোস্টের প্রতিনিধি দল ঘানায় এসে হুযুরের সাথে সাক্ষাৎ করার সৌভাগ্য লাভ করে। সেই প্রতিনিধি দল হুযুরের সমীপে আবেদন করে যে, যেভাবে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ঘানার হাসপাতাল আছে, অনুরূপ হাসপাতাল আমাদের আইভরিকোস্টেও খোলা হোক। যাহোক, হুযুর তার অনুমোদন দেন এবং এর জন্য কার্যক্রম আরম্ভ হয়। ১৮ মার্চ ১৯৮৩ সালে ডাক্তার সাহেব লেগুস থেকে আইভরি কোস্টে চলে যান এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। যেহেতু, ফ্রেঞ্চ ডাক্তারের প্রয়োজন ছিল আর তিনি ফ্রেঞ্চ ভাষা জানতেন, তাই তাকে নাইজেরিয়া থেকে সেখানে পাঠানো হয় এবং সেখানে তিনি আহমদীয়া ডিসপেনসারি খোলার অনুমতি পেয়ে যান। ১৯৮৪ সাল থেকে আমৃত্যু তিনি আইভরি কোস্টে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি ওসীয়্যত করেছিলেন। তার

সহধর্মিণীও ইন্তেকাল করেছেন। তার এক পুত্র আছে, যার নাম হলো বশিরুদ্দীন মাহমুদ বুদ্দন এবং কন্যা নাশমিয়া আয়েশা ওয়ারদা। আল্লাহ্ তা'লা এই সন্তানদেরও খিলাফত ও জামা'তের সাথে সম্পৃক্ত রাখুন।

আইভরি কোস্ট-এর আমীর ও মিশনারী ইনচার্জ আব্দুল কাইয়ুম পাশা সাহেব বলেন, আইভরি কোস্টে প্রায় ছত্রিশ বছর আহমদীয়া ক্লিনিক আবিজান-এ মেডিকেল অফিসার হিসেবে তিনি সেবা প্রদান করেছেন। তিনি একজন খুব ভালো ডাক্তার, একজন ভালো মানুষ এবং আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত আইভরি কোস্টের একজন বিশিষ্ট পুণ্যাত্মা সদস্য ছিলেন। তিনি বলেন, খাকসারের সাথে ডাক্তার সাহেবের প্রায় আঠারো বছরের সম্পর্ক ছিল। সর্বাবস্থায় তাকে ভালো মানুষ হিসেবে পেয়েছি। সবাইকে সাহায্যকারী, জামা'তী কাজে সঠিক পরামর্শদাতা, অতিথিপরায়ণ, সদাচারী, আর সুবসন-সুবচন মানুষ ছিলেন। জামা'তের বিভিন্ন দায়িত্বেও নিয়েজিত ছিলেন। অনেক উদারমনা মানুষ ছিলেন। শিশুদের সাথে পরম স্নেহ ও ভালোবাসাপূর্ণ আচরণ করতেন। অধিকাংশ সময় শিশুদেরকে তোহফা স্বরূপ দেয়ার জন্য ক্লিনিকে কিছু রাখা থাকত। যেসব অসুস্থ্য শিশু আসত তাদেরকে তোহফাও দিতেন, অর্থাৎ খেলনা, টফি প্রভৃতি। মিশনে অবস্থানরত শিক্ষার্থী এবং গরীব আহমদী পরিবারদের অনেক সাহায্য করতেন।

সেখানকার একজন মুবাল্লেগ লিখেন, তার কাছে যখন কোন রোগী থাকত না তখন তাকে কোন খাদেম অথবা কোন নাসেরের তালীম ও তরবিয়তে ব্যস্ত থাকতে দেখেছি। এমন নয় যে, রোগী না থাকলে বসে থাকবেন। কোন না কোন জামা'তী কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখতেন। এক্ষেত্রে কখনো মলফুযাত অথবা জুমুআর খুতবার ফ্রেঞ্চ ভাষায় অনুবাদ করতেন এবং জামা'তের বন্ধুদেরকে তার ফটোকপি করে পাঠাতেন। তিনি সর্বদা মানবতার সেবার জন্য প্রস্তুত থাকতেন। নিজ খরচে রোগীদের ঔষধ ক্রয় করে দিতেন। কখনোবা দরিদ্র লোকদের বা অন্যদেরও ঘরের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় জিনিস যেমন, চাউল, তেল প্রভৃতি তিনি সরবরাহ করতেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের সাথে ক্ষমা ও কৃপাসুলভ ব্যবহার করুন।

পরবর্তী জানাযা ডাক্তার রাজা নাসীর আহমদ জাফর সাহেবের সহধর্মিণী সালমা বেগম সাহেবার যিনি গত ২৪ জানুয়ারি তারিখে ৮৫ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তার পিতা রাজা ফযল দাদ খান সাহেব আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় নিজ বংশের প্রথম আহমদী ছিলেন। যারা লিখেছেন তারা অর্থাৎ তার সন্তানরা তার সম্পর্কে লিখেছে যে, তার নামাযের দৈর্ঘের দৃষ্টান্ত প্রবাদস্বরূপ পুরো পরিবারেই সুপ্রসিদ্ধ ছিল। খুবই সচ্চরিত্রা, উত্তম স্বভাবের অধিকারিণী, সেবাপরায়ণ, ত্বাকওয়াশীলা, বিশ্বস্ত, সাহসী, বড়মনা, বুদ্ধিমতি ও পরম উদ্যমী, উন্নত চরিত্র, গাম্ভীর্যপূর্ণ, অনেক দোয়াগো, অত্যন্ত ধৈর্যশীলা, কৃতজ্ঞ, স্বল্পেতুষ্ট এবং আল্লাহ্‌র ওপর আস্থাশীলা মহিলা ছিলেন। আল্লাহ্‌র কৃপায় মরহুমা ওসীয়্যতকারিণী ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে তিনি দুই পুত্র এবং তিন কন্যা রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার প্রতি ক্ষমা ও কৃপাসুলভ আচরণ করুন।

পরবর্তী জানাযা হলো, আল্ শিরকাতুল ইসলামিয়া, যুক্তরাজ্যের চেয়ারম্যান আব্দুল বাকী আরশাদ সাহেবের সহধর্মিণী মোকাররামা কিশওয়ার তানভীর আশরাফ সাহেবার, যিনি গত ২৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে ৮৭ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। মরহুমা পরম ধৈর্য ও সাহসিকতার সাথে নিজ বার্ধক্যে বিভিন্ন রোগব্যাধির মোকাবিলা করেছেন আর খোদা তা'লার ইচ্ছায় সন্তুষ্ট থেকে স্বীয় প্রিয় প্রভুর সন্নিধানে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি তার অবর্তমানে দুই পুত্র ও দুই কন্যা রেখে গেছেন। একইভাবে অনেক পৌত্র-পৌত্রী, দৌহিত্র, দৌহিত্রী স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে রেখে গেছেন। তার এক জামাতা নাসীর উদ্দীন সাহেব বর্তমানে যুক্তরাজ্যের নায়েব আমীর হিসেবে কাজ করার তৌফিক পাচ্ছেন। ছেলে নাবীল আরশাদও

সেবা করার তৌফিক পাচ্ছেন, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)'র যুগেও আর আমিও যখনই কোন কাজের জন্য তাকে ডেকেছি, তিনি তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হয়ে যান। তিনি সন্তানদের উত্তম তরবিয়ত করেছেন। মরহুমা অগণিত গুণের আধার ছিলেন। খুবই পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। (তিনি) অত্যন্ত বিনয়ী, একজন নিবেদিতপ্রাণ, নিষ্ঠাবতী ও পুণ্যবতী নারী ছিলেন। নিয়মিত নামায-রোযায় অভ্যস্ত এবং চাঁদা প্রদানের ক্ষেত্রে ত্বরিত ছিলেন। সর্বদা মনখুলে সদকা-খয়রাত করতেন। আরশাদ বাকী সাহেব লিখেছেন, তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ লন্ডনে বসবাস করেছেন, এ সময়ের মধ্যে ১৯৮৪ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)'র লন্ডনে হিজরতের পর তিনি আমার সাথে জামা'তী কর্মকাণ্ডে অনেক সহযোগিতা করেছেন আর সর্বদা জামা'তের কাজকে প্রাধান্য দিয়েছেন। সবদিক থেকে নিজের ঘরকে শান্তিপূর্ণ ও জান্নাত প্রতীম বানিয়ে রেখেছেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) বলতেন, শান্তির দিক থেকে এই ঘরটি আমার পছন্দনীয়। তার মেয়ে বলেন, সর্বাবস্থায় খোদার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকতেন। সুখ-দুঃখ সর্বাবস্থায় সানন্দে নিয়তির বিধান মেনে নিতেন আর কখনো কোন অভিযোগ-অনুযোগ করতেন না। তিনি সৌদি আরবেও ছিলেন। যেসব আহমদী বন্ধুরা সেখানে হজ্জ বা উমরা করতে যেতেন, তিনি তাদের অনেক সেবার সুযোগ পেয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা প্রয়াতের প্রতি ক্ষমা ও দয়াসুলভ আচরণ করুন।

পরবর্তী জানাযা হলো সুদান নিবাসী আব্দুর রহমান হুসেইন মুহাম্মদ খায়ের সাহেবের। তিনি গত ২৪ ডিসেম্বর (মাত্র) ৫৬ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। আহমদীয়া জামা'তের সাথে পরিচিত হওয়ার পূর্বে তিনি কোন ইসলামী ফির্কার সাথে যুক্ত ছিলেন না বরং তার বিভিন্ন বিশ্বাস যেমন, নাসেখ-মনসুখ এবং জিন্ন ইত্যাদি সম্পর্কে সন্দেহ ছিল। তার বড় ভাই উসমান হুসেইন সাহেব সৌদি আরবে কাজ করতেন। সেখানে জামা'তের সাথে তার পরিচয় হলে তিনি প্রয়াত আব্দুর রহমান সাহেবের কাছে তা উল্লেখ করেন, এটি ২০০৭ সালের কথা। ভাইয়ের কাছে আহমদীয়াত সম্পর্কে শোনার পর থেকে আব্দুর রহমান সাহেব এম.টি.এ. দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েন। সে সময় তার এলাকায় এম.টি.এ.-র সম্প্রচার দেখা কষ্টসাধ্য ছিল, এজন্য তিনি অনেকগুলো ডিশ এন্টেনা পরিবর্তন করেন, অনেক অর্থ খরচ করেন আর অবশেষে তিনি এম.টি.এ. (চ্যানেল) পেয়ে যান। এরপর থেকে তার রীতি ছিল, কাজ থেকে ফিরে অধিকাংশ সময় এম.টি.এ. দেখে কাটাতেন। অবশেষে আশ্বস্ত হওয়ার পর ২০১০ সালে তিনি বয়আত করার তৌফিক লাভ করেন। বয়আত করার পর তিনি তার সকল আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবকে তবলীগ করেন। মরহুমের পুণ্য বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে বিনয়, নম্রতা, আতিথেয়তা, দরিদ্রদের লালন এবং মানুষের সাথে উত্তম ব্যবহার ছিল উল্লেখযোগ্য। ২০১৩ সালে সুদানে জামা'ত প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালনের সুযোগ পেয়েছেন আর এজন্য তিনি অকাতরে আর্থিক কুরবানীও করেছেন। মরহুম অনেক দরিদ্র আহমদীকে আর্থিকভাবে সাহায্য করতেন। সুদানের একটি অঞ্চলে বসবাসকারী এক অত্যন্ত দরিদ্র গোত্রের আহমদী যখন এলাকাবাসীদের পক্ষ থেকে নির্যাতনের লক্ষ্যে পরিণত হয় তখন মরহুম উদারহস্তে তাদের আর্থিক সাহায্য করেন এবং তার প্রয়োজনাদির প্রতি খেয়াল রাখেন। এছাড়া অন্যদের প্রতিও যত্নবান ছিলেন। প্রত্যেক শুক্রবার নিজের গাড়িতে করে বিভিন্ন স্থান থেকে আহমদীদের নামায সেন্টারে নিয়ে আসতেন আবার জুমুআর নামাযের পর তাদেরকে নিজেদের বাড়িতে পৌঁছে দিতেন। অ-আহমদীরাও তার সচ্চরিত্রতার প্রশংসা করেন। নিয়মিত চাঁদা প্রদান করতেন আর উদারহস্তে খরচ করতেন। সুদানের প্রথম মজলিসে আমেলাতেও তিনি কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন আর আমৃত্যু উক্ত দায়িত্ব পালন করেছেন। মরহুম তার অবর্তমানে স্ত্রী ছাড়াও দুই পুত্র এবং দু'জন কন্যা স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ রেখে

গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা জামা'ত এবং খিলাফতের সাথে তাদের সম্পর্কও সুদৃঢ় করুন আর মরহুমের প্রতি ক্ষমা ও কৃপাসুলভ আচরণ করুন।

আমি যেমনটি বলেছি, নামাযের পর আমি তাদের গায়েবানা জানাযা পড়াব। (ইনশাআল্লাহ্)

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)